ষষ্ঠ অধ্যায়

গে মস্তিস্ক এবং গে জিনের খোঁজে

সমকামীদের যৌনপ্রবৃত্তি আমাদের পরিচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ বিষমকামী লোকজনের থেকে আলাদা, এটা আমরা জানি। কারণ তারা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে আকর্ষণ অনুভব করে সমলিঙ্গের প্রতি। যেহেতু বিজ্ঞানের কাজই হচ্ছে প্রতিটি ঘটনার পেছনে যুক্তিনিষ্ঠ কারণ অনুসন্ধান, তাই বৈজ্ঞানিক পেশায় নিয়োজত অনেক গবেষকই অনুমান করলেন সমকামিতার পেছনেও নিশ্চয় কোন বৈজ্ঞানিক কারণ থাকতে হবে। কিন্তু কারণের উৎসটা কোথায়? তাদের মস্তিস্কের আকার, আকৃতি বা গঠন কি সাধারণদের থেকে একটু আলাদা? এ ব্যাপারটি বিজ্ঞানীদের ভাবিয়েছে পুরোমাত্রায়। ভাবনার কারণ আছে। কারণ যৌন- প্রবৃত্তির কেন্দ্রীয় উৎস হল মস্তিস্ক। মস্তিস্কই নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের নানা পছন্দ, অপছন্দ, ঘৃণা, অভিরুচি আর ফ্যান্টাসি। মস্তিস্কই জীবনের বিভিন্ন চড়াই- উৎরাই পেরিয়ে সিদ্ধান্তে আসে আমাদের ঐশ্বরিয়াকে ভাল লাগতে হবে, নাকি শাহরুখকে। মস্তিস্কই সিদ্ধান্ত নেয় এই মুহূর্তে আমাদের ভুতের গল্প ভাল লাগবে, নাকি আবেগময় রোমান্টিক উপন্যাস। কাজেই যৌনপ্রবৃত্তি তৈরীতে মস্তিস্কের ভূমিকাটা কি সেটা বিজ্ঞানীদের জন্য খুব ভাল করে বোঝা চাই। কিন্তু সমকামী মস্তিস্ক বিশ্লেষণের আগে বিজ্ঞানীরা আরেকটি জিনিস খুব গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ্য করেছেন। সেটা হচ্ছে নারী পুরুষের মস্তিস্ক আর অর্জিত ব্যবহারে পার্থক্য।

মস্তিস্কের যৌনতা : নারী বনাম পুরুষ

বিজ্ঞানীরা প্রথম এধরণের গবেষণা শুরু করেছিলেন ল্যাবরেটরিতে ইঁদুরদের মস্তিস্ক বিশ্লেষণ করে। ১৯৭৮ সালে ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রজার গোর্কি ইঁদুর নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখেন ছেলে ইঁদুরের মস্তিস্কের হাইপোথ্যালমাস (hypothalamus) নামের প্রত্যঙ্গটি মেয়ে ইঁদুরের থেকে তিনগুন বড়। ঠিক একই ধরণের পার্থক্য বিজ্ঞানীরা পরবর্তীতে পেলেন মানুষের মস্তিস্ক বিশ্লেষণ করেও। পুরুষ মস্তিস্কের সুপ্রাকিয়াস্মিক নিউক্লিয়াসের (suprachiasmatic nucleus) আকার মেয়েদের চেয়ে প্রায় ২.৫ গুন বড় হয়। আবার মেয়েদের ক্ষেত্রে কর্পাস কালোসাম (corpus callosum) এবং এন্টিরিয়র কমিসুরের (anterior commissure) নামে দুইটি প্রত্যঙ্গের আকার পুরুষদের

প্রত্যঙ্গগুলোর তুলনায় বিবর্ধিত পাওয়া গেছে। কিন্তু এগুলোর কোন প্রভাব কি প্রাত্যহিক জীবন যাত্রায় আছে? এক কথায় জবাব দেয়া মুশকিল। জীববিজ্ঞানীরা যেমন পুরুষ-নারীর মস্তিস্কের আকার আয়তন আর গঠন নিয়ে গবেষণা করেছেন, তেমনি তাদের অর্জিত ব্যবহার নিয়ে নানা ধরণের কৌতুহলোদ্দীপক কাজ করে চলেছেন বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা[1]। তারা বলেন, ডারউইনের 'যৌনতার নির্বাচন' (Sexual selection) বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মূল ভূমিকা রেখে থাকে তবে এর একটি প্রভাব আমাদের দীর্ঘদিনের মানসপট তৈরিতেও পড়বে। যৌনতার উদ্ভবের কারণে সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে নারী-পুরুষ একই মানব প্রকৃতির অংশ হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে প্রাকৃতিকভাবেই তৈরি হয়ছে এক ধরণের মনোদৈহিক পার্থক্য – জৈববৈজ্ঞানিক পথেই। মনোবিজ্ঞানীরা অনেকেদিন ধরেই লক্ষ্য করছিলেন যে, ছেলে মেয়েদের পারস্পরিক চাহিদা পছন্দ, অপছন্দে যেমন মিল আছে, তেমনি আবার কিছু ক্ষেত্রে আছে চোখে পড়ার মতই পার্থক্য। এটা হবার কথাই। নারী পুরুষ উভয়কেই সভ্যতার সূচনার প্রথম থেকেই ডারউইন বর্নিত 'সেক্সুয়াল সিলেকশন' নামক বন্ধুর পথে নিজেদের বিবর্তিত করে নিতে হয়েছে, শুধু দৈহিকভাবে নয় মন মানসিকতাতেও। দেখা গেছে, ছেলেরা আচরণগত দিক দিয়ে মেয়েদের চেয়ে অনেক প্রতিযোগিতামূলক (competitive) হয়ে থাকে। ছেলেদের স্বভাবে প্রতিযোগিতামূলক হতে হয়েছে কারণ তাদের বিভিন্ন গোত্রের সাথে প্রতিযোগিতা করে, যুদ্ধ বিগ্রহ করে বাঁচতে হয়েছে আদি কাল থেকেই। যারা এ ধরনের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে টিকে থাকতে পেরেছে তারাই অধিক হারে সন্তান সন্ততি এ পৃথিবীর বুকে রেখে যেতে পেরেছে।

আধুনিক জীবনযাত্রাতেও পুরুষদের এই প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতাকে একটু চেষ্টা করলেই ধরা যাবে। একটা মজার উদাহরণ দেয়া যাক। আমেরিকার একটি জরিপ থেকে দেখা গেছে গাড়ি চালানোর সময় কখনো পথ হারিয়ে ফেললে পুরুষেরা খুব কমই পথের অন্য মানুষের কাছ থেকে চায়। তারা বরং নিজেদের বিবেচনা থেকে নিজেরাই পথ খুঁজে নিতে তৎপর হয়, না পারলে বড়জোর পথ- চিহ্ন বা মানচিত্রের দ্বারস্থ হয়, কিন্তু কাউকে জিজ্ঞাসা করে না । আর অন্যদিকে মেয়েরা প্রথমেই গাড়ি থামিয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করে নেয়। আসলে পুরুষেরা গাড়ি থামিয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পছন্দ করে না, কারণ তাদের 'আত্মভরি' মানসিতার কারণে ব্যাপারটাকে তারা 'যুদ্ধে পরাজয়' হিসেবে বিবেচনা করে ফেলে নিজেদের অজান্তেই। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তাদের মানসপটে এত প্রবলভাবে রাজত্ব করে না বলে তারা সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করে

[1] বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান মুলতঃ বিজ্ঞানের দুটো চিরায়ত শাখাকে একীভুত করেছে; একটি হচ্ছে বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞান (evolutionary biology) এবং অন্যটি বৌদ্ধিক মনোবিজ্ঞান (Cognitive Psychology)। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান বিষয়ে আমার একটি ই-বুক মুক্তমনা ওয়েব সাইট থেকে ডাউন লোড করা যাবে। ঠিকানা - http://www.mukto-mona.com/Articles/avijit/Manob_prokriti_Avijit.pdf । এ অধ্যায়টির বেশ কিছু অংশ আমার বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের উপর করা ইবুক থেকে নেওয়া হয়েছে।

সমাধানে পৌঁছুতে উদগ্রীব থাকে। শুধু গাড়ি চালানোই একমাত্র উদাহরণ নয়; পুরুষেরা নারীদের চেয়ে অর্থ, বিত্ত আর সামাজিক প্রতিপত্তি এবং প্রতিষ্ঠার প্রতি যে বেশি আকৃষ্ট তা যে কোন সমাজেই প্রযোজ্য। এটাও এসেছে দীর্ঘদিনের প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা থেকে।

মানব ইতিহাসের পাতায় এবারে একটু চোখ রাখি। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, পুরুষেরা এক সময় ছিলো হান্টার বা শিকারী, আর মেয়েরা ফলমূল সংগ্রাহক। প্রয়োজনের তাগিদেই একটা সময় পুরুষদের একে অন্যের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে; অন্য গোত্রের সাথে মারামারি হানাহানি করতে হয়েছে; নিজের সাম্রাজ্য বাড়াতে হয়েছে; অস্ত্র চালাতে হয়েছে। তাদেরকে কারিগরী বিষয়ে বেশি জড়িত হতে হয়েছে। আদিম সমাজে অস্ত্র চালনা, করা শিকারে পারদর্শী হওয়াকে বেঁচে থাকার অন্যতম নিয়ামক হিসেবে চিহ্নিত করা হত। যারা এগুলোতে পারদর্শী হয়ে উঠেছে তারাই অধিক হারে সন্তান সন্ততি এ পৃথিবীতে রেখে যেতে পেরেছে, যারা এগুলো পারেনি তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পৃথিবীতে মানব সভ্যতার ইতিহাস ঘাটলে পাওয়া যাবে পুরুষেরা শুধু আত্মরক্ষা করতেই যুদ্ধ করেনি, যুদ্ধ করেছে সাম্রাজ্য বাড়াতে, আর সম্পত্তি এবং নারীর দখল নিতে। এখনো এই মানসিকতার প্রভাব বিরল নয়। এর বাস্তব প্রমাণ বিজ্ঞানীরা পেয়ছেন ভেনিজুয়ালার আদিম গোষ্ঠী ইয়ানোমামো (Yąnomamö)দের নিয়ে গবেষণা করে। নৃতত্ত্ববিদ নেপোলিয়ন চ্যাংনন এই আদিম গোষ্ঠী নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে খুব অবাক হয়েই লক্ষ্য করেন,

> ‘এরা শুধু সম্পদ আহরণের জন্য যুদ্ধ করেনা, এরা যুদ্ধ করে নারীদের উপর অধিকার নিতেও’।

দেখা গেল গোষ্ঠীতে যতবেশি শক্তিশালী এবং সমর-দক্ষ পুরুষ পাওয়া যাচ্ছে, তত বেশি তারা নারীদের উপর অধিকার নিতে পেরেছে।

চিত্রঃ ইয়ানোমামো গোত্রের পুরুষেরা পার্শ্ববর্তী গ্রাম আক্রমনের আগে এভাবেই সমরশিক্ষা গ্রহণ এবং নিজেদের মধ্যে প্রদর্শন করে থাকে। (*ছবি* – সায়েন্টিফিক আমেরিকানের সৌজন্যে)

আসলে যতই অস্বীকার করা হোক না কেন, কিংবা শুনতে আমাদের জন্য যতই অস্বস্তি লাগুক না কেন, প্রাককৃষিপূর্ব সমাজে যে সহিংসতা এবং আগ্রাসনের মাধ্যমে জোর করে একাধিক নারীদের উপর দখল নিয়ে পুরুষেরা নিজেদের জিন ভবিষ্যত প্রজন্মে ছড়িয়ে দিয়েছিল, এটা নিঠুর বাস্তবতা। পুরুষদের এই সনাতন আগ্রাসী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় আজকের সমাজে ঘটা যুদ্ধের পরিসংখ্যানেও। এখনো চলমান ঘটনায় চোখ রাখলে দেখা যাবে - প্রতিটি যুদ্ধেই অসহায় নারীরা হচ্ছে যৌননির্যাতনের প্রথম এবং প্রধান শিকার। বাংলাদেশে, বসনিয়া, রুয়ান্ডা, আলবেনিয়া, কঙ্গো, বুরুন্ডিয়া, প্যালেস্টাইন, ইরাক, ইরান সহ প্রতিটি যুদ্ধের ঘটনাতেই সেই নগ্ন সত্যই বেরিয়ে আসে যে, এমনকি আধুনিক যুগেও নারীরাই থাকে যুদ্ধের অন্যতম প্রধাণ শিকার।

এদিকে পুরুষেরা যখন হানাহানি মারামারি করে তাদের 'পুরুষতান্ত্রিক' জিঘাংসা চরিতার্থ করতে সচেষ্ট হয়েছে, অন্য দিকে, মেয়েরা দায়িত্ব নিয়েছে সংসার গোছানোর। গৃহস্থালীর পরিচর্যা মেয়েরা বেশি অংশগ্রগণ করায় তাদের বাচনিক এবং অন্যান্য যোগাযোগের ক্ষমতা ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি বিবর্ধিত হয়েছে। একটি ছেলের আর একটি মেয়ের মস্তিস্ক বিশ্লেষণ করে গঠনগত যে বিভিন্ন পার্থক্য পাওয়া গেছে, তাতে বিবর্তনীয় অনুকল্পই সঠিক প্রমাণিত হয় । ছেলেদের ব্রেনের আকার গড়পরতা মেয়েদের মস্তিস্কের

চেয়ে অন্ততঃ ১০০ গ্রাম বড় হয়[2], কিন্তু ওদিকে মেয়েদের মস্তিস্ক ছেলেদের চেয়ে অনেক ঘন থাকে। মেয়েদের মস্তিস্কে কর্পাস ক্যালোসাম এবং এন্টেরিয়র কমিসুর নামক প্রত্যঙ্গ সহ টেম্পোরাল কর্টেক্সের যে এলাকাগুলো ভাষা এবং বাচনিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সহায়তা করে বলে মনে করা হয়, মেয়েদের ক্ষেত্রে সেগুলো ছেলেদের চেয়ে অন্ততঃ ২৯ ভাগ বিবর্ধিত থাকে। শুধু তাই নয়, মেয়েদের মস্তিস্কে রক্তসঞ্চালনের হার ছেলেদের ব্রেনের চেয়ে শতকরা ১৫ ভাগ বেশি বলে জানা গেছে।

আরো কিছু পার্থক্য উল্লেখ করা যাক। ছেলেদের মস্তিস্কের প্যারিয়েটাল কর্টেক্সের আকার মেয়েদের মস্তিস্কের চেয়ে অনেক বড় হয়। বড় হয় অ্যামাগদালা (amygdala) নামের বাদাম আকৃতির প্রত্যঙ্গের আকারও । এর ফলে দেখা গেছে ছেলেরা জ্যামিতিক আকার নিয়ে নিজেদের মনে নাড়াচাড়ায় মেয়েদের চেয়ে অনেক দক্ষ হয়[3]। তারা একটি ত্রিমাত্রিক বস্তুকে সামনে থেকে দেখেই নিজেদের মনের আয়নায় নড়িয়ে চড়িয়ে ঘুরিয়ে ঘারিয়ে বুঝে নিতে পারে বস্তুটি, পেছন থেকে, নীচ থেকে বা উপর থেকে কিরকম দেখাতে পারে। জরিপ থেকে দেখা গেছে, ছেলেরা গড়পরতা বিমূর্ত এবং 'স্পেশাল' কাজের ব্যাপারে বেশী সাবলীল, আর মেয়েরা অনেক বেশী বাচনিক এবং সামাজিক কাজের ব্যাপারে।

মস্তিস্কের গঠনগত পার্থক্যের প্রভাব পড়ে তাদের অর্জিত ব্যবহারে, আর সেই ব্যবহারের প্রভাব আবার পড়ে সমাজে। অভিভাবকেরা সবাই লক্ষ্য করেছেন, মেয়ে শিশুরা ছেলে শিশুদের চেয়ে অনেক আগে কথা বলা শিখে যায় - একই রকম পরিবেশ দেয়া সত্ত্বেও। ছেলেদের বাচনিক যোগাযোগের ক্ষেত্রগুলো গড়পড়তা মেয়েদের মত উন্নত না হওয়ায় ডাক্তাররা লক্ষ্য করেন পরিণত বয়সে ছেলেরা সেরিব্রাল পালসি, ডাইলেক্সিয়া, অটিজম এবং মনোযোগ- স্বল্পতা সহ বিভিন্ন মানসিক রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। এ ধরনের আরো পার্থক্য আছে। ব্যবহারিক জীবনে দেখা যায় ছেলেরা যখন কাজ করে অধিকাংশ সময়ে শুধু একটি কাজে নিবদ্ধ থাকতে চেষ্টা করে, এক সাথে দু- তিনটা কাজ করতে পারে না, প্রায়শই গুবলেট করে ফেলে। আর অন্যদিকে মেয়েরা অত্যন্ত সুনিপুন ভাবে ছয় সাতটা কাজ একই সাথে করে ফেলে। এটাও হয়েছে সেই শিকারী –সংগ্রাহক পরিস্থিতি দীর্ঘদিন মানসপটে রাজত্ব করার কারণেই। শিকারী হবার ফলে পুরুষদের স্বভাবতই শিকারের

[2] একটি ব্যাপার এখানে পরিস্কার করা প্রয়োজন। বইয়ের এই অংশে জৈববৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে নারী- পুরুষের মস্তিস্কের গঠনগত পার্থক্য দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, এটি কোন লিঙ্গভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রচেষ্টা নয়। ছেলেদের মস্তিস্কের আকার বড় হবার অর্থ এই নয় যে, ছেলেদের বুদ্ধি মেয়েদের থেকে বেশি কিংবা ছেলেরা যে কোন কাজে মেয়েদের থেকে অধিকতর দক্ষ। অতীতে পুরুষতান্ত্রিক প্রথা টিকিয়ে রাখতে এ ধরনের ভুল স্টেরিওটাইপিং এর চেষ্টা করা হয়েছিলো। ছেলে আর মেয়েদের মস্তিস্কের গঠনে জৈববৈজ্ঞানিক কিছু পার্থক্য রয়েছে, যার কারণ বিবিধ। এইটি বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরাই মূল উপজীব্য।

[3] Linn, M. C., & Peterson, A. C. (1985). Emergence and characterization of sex differences in spatial ability: A meta-analysis. Child Development, 56(6), 1479-1498.;

প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হত, ফলে তাদের মানসজগত একটিমাত্র বিষয়ে নিবদ্ধ হয়ে গড়ে উঠেছিল, আর মেয়েদের যেহেতু ঘরদোর সামলাতে গিয়ে বাচ্চা কোলে নিয়ে হাজারটা কাজ করে ফেলতে হত, তারা দক্ষ হয়ে উঠেছিল একাধিক কাজ একসাথে করাতে। 'মাল্টি টাস্কিং' এই মজ্জাগত দক্ষতার কারণেই বোধ হয় আজকের এই প্রতিযোগিতামূলক 'কর্পোরেট জগতে'ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ হিসেবে মেয়েরা ভাল করছে, এবং তাদের অধিক হারে সে সব জায়গায় নিয়োগ দেয়া হয়। একটা জিনিস এখানে পরিস্কার করে বলা দরকার। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান বলে যে, ছেলেরা গড়পরতা বিশেষ এবং নির্দিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে (সাধারণতঃ) বেশি দক্ষ হয়, আর মেয়েরা সামগ্রিকভাবে বহুমাত্রিক কাজে (multitasking)। আমাদের আধুনিক সমাজ বহু কিছুর সংমিশ্রন। এখানে সফল হতে 'স্পেসিফিক' দক্ষতা যেমন লাগে, তেমনি লাগে 'মাল্টিটাসকিং'ও। কাজেই, কেউ যদি নারীদের গৃহবন্দী করার অভিপ্রায়ে সেই পুরাতণ 'ব্যাক টু দ্য কিচেন' আর্গুমেন্ট নিয়ে আসতে চান সেটা মোটেই গ্রহণযোগ্য হবে না। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা অফিসের চেয়ার টেবিলে বসে কাজ করার ব্যাপারটা কিন্তু খুবই আধুনিক ঘটনা। এটা ঠিক পুরুষেরা একসময় শিকারী ছিলো, আর মেয়েরা সংগ্রাহক, কিন্তু তা বলে কি এটা বলা যাবে, মেয়েরা যেহেতু একসময় সংগ্রাহক ছিলো, সেহেতু এখন তারা অফিসে কাজ করতে পারবে না, বা কম্পিউটারের চাবি টিপতে পারবে না এমন দিব্যি তো কেউ দিয়ে দেয়নি। সেজন্যই আধুনিক বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যাবে মেয়েরা অফিস আদালতে তো বটেই, ছেলেদের সাথে পাল্লা দিয়েই কাজ করে চলেছে মাইনিং ফিল্ড থেকে শুরু করে একেবারে নাসার বহির্জাগতিক গবেষণাগার সহ মোটামুটি সব জায়গাতেই।

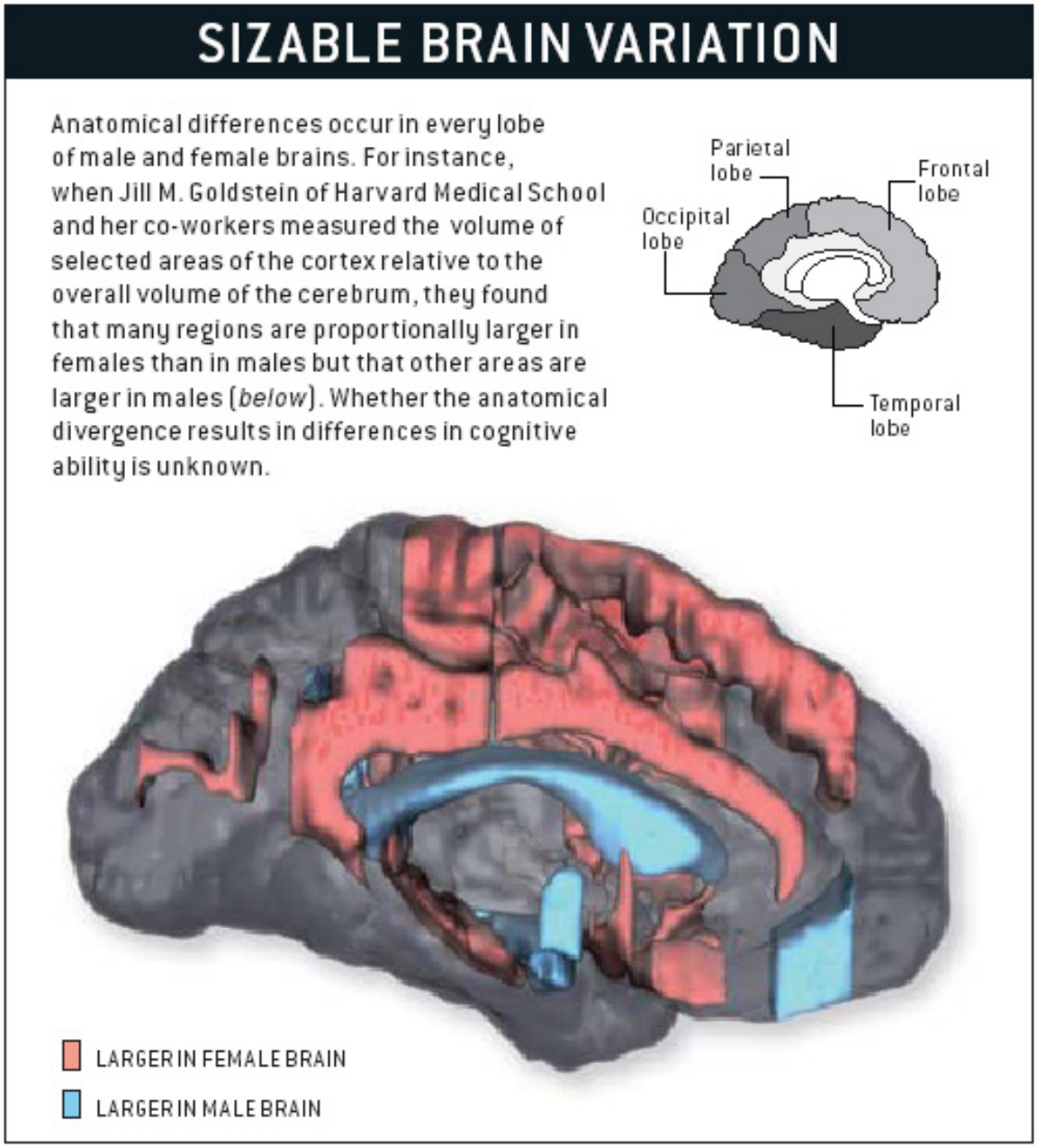

চিত্রঃ বিজ্ঞানীরা ছেলে এবং মেয়েদের মস্তিস্ক বিশ্লেষণ করে গঠনগত বিভিন্ন পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন (*ছবি* – সায়েন্টিফিক আমেরিকানের সৌজন্যে)

কিন্তু তারপরেও ছেলে- মেয়েদের পেশাগত কাজের ক্ষেত্রে পছন্দ অপছন্দে বেশ কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। ছেলেরা গড়পরতা সুনির্দিষ্ট এবং বিশেষ কাজের ব্যাপারে দক্ষ বলেই সম্ভবতঃ অধিক হারে স্থাপত্যবিদ্যা, গণিত কিংবা প্রকৌশলবিদ্যা পড়তে উৎসুক হয়, আর মেয়েরা যায় শিক্ষকতা, নার্সিং, ডাক্তারী কিংবা সমাজবিদ্যায়। এই ঝোঁক সংস্কৃতি এবং সমাজ নির্বিশেষে একই রকম দেখা গেছে। এই রকম সুযোগ দেয়ার পরও

বাংলাদেশের অধিকাংশ মেয়েরা বড় হয়ে বুয়েটের চেয়ে মেডিকেলে পড়তেই উদগ্রীব থাকে। কোন সংস্কৃতিতেই ছেলেরা খুব একটা যেতে চায় না নার্সিং-এ, মেয়েরা যেমনিভাবে কখনোই 'গ্যারেজ মেকানিক' হতে চায় না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ।

শুধু তাই নয়, মস্তিস্ক কিভাবে সমন্বিত হবে সেই প্রক্রিয়াতেও আছে নারী- পুরুষে পার্থক্য। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে ফাংশনাল ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং (fMRI) বিশ্লেষণ করে। একটি পরীক্ষায় এক দল মেয়ে এবং ছেলেদের আলাদা করে বসিয়ে তাদের 'লেট্', 'জেট্' প্রভৃতি অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করতে দেয়া হয়েছিলো। শব্দগুলো উচ্চারণের সময় fMRI ব্যবহার করে তাদের মস্তিস্কের ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলোর ছবি তুলে নেয়া হল। ফলাফল যা পাওয়া গেল তা সত্যই বিস্ময়কর। দেখা গেল একই কাজ করতে গিয়ে ছেলেদের মাথা আর মেয়েদের মাথা কাজ করছে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে। ছেলেরা শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে মস্তিষ্কের কেবল একটি অংশের (বাম ইনফেরিওর ফ্রন্টাল গাইরাস) উপর নির্ভরশীল থাকে, কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে মস্তিস্কের দুই অংশই (বাম এবং ডান ইনফেরিওর ফ্রন্টাল গাইরাস) সমান ভাবে আন্দোলিত হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে, মেয়েদের মস্তিস্ক ছেলেদের তুলনায় অনেক সুষমভাবে বিন্যস্ত হয়ে কাজ করে। fMRI র মাধ্যমে তোলা ছবিগুলো সত্যই নাটকীয় – বিজ্ঞানীরা দেখেছেন শব্দোচ্চারণের সাথে সাথে মস্তিস্কের বিভিন্ন অংশ আলোকিত হয়ে উঠে, এবং নারী পুরুষে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে এবং ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়[4]।

নারীপুরুষের মস্তিস্কের গঠনগত পার্থক্যের ছাপ আছে তাদের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদায়। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডেভিড বাস ছয়টি মহাদেশ এবং পাঁচটি দ্বীপপুঞ্জের ৩৭ টি ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠা ১০০৪৭ জন লোকের উপর সমীক্ষা চালিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সঙ্গী নির্বাচনের সময় ছেলেরা গড়পরতা দয়া, বুদ্ধিমত্তা আশা করে, কিন্তু পাশাপাশি প্রত্যাশা করে তারুন্য এবং সৌন্দর্য। অন্যদিকে মেয়েরাও গড়পরতা ছেলেদের কাছ থেকে দয়া, বুদ্ধিমত্তা আশা করে ঠিকই, পাশাপাশি সঙ্গীর কাছ থেকে আশা করে ধন সম্পদ আর স্ট্যাটাস[5]। এ ধরণের চাহিদার পার্থক্য আরো প্রকট হয়েছে নারী- পুরুষদের মধ্যকার যৌনতা নিয়ে 'ফ্যান্টাসি' কেন্দ্রিক গবেষনাগুলোতেও। ব্রুস এলিস এবং ডন সিমন্সের করা ইউনিভারসিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষণায় বেড়িয়ে এসেছে যে, পুরুষ এবং নারীদের মধ্যকার যৌনতার ব্যাপারে ফ্যান্টাসিগুলো যদি

[4] Shaywitz BA, Shaywitz SE, Pugh KR, Constable RT, Skudlarski P, Fulbright RK, Bronen RA, Fletcher JM, Shankweiler DP, Katz L, et al., Sex differences in the functional organization of the brain for language, Nature. 1995 Feb 16;373(6515):561-2.

[5] Buss, D.M., 1989. Sex differences in human mate preferences: evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. Behavioral and Brain Sciences 12, pp. 1–49.

সততার সাথে লিপিবদ্ধ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে তিনজনের মধ্যে একজন পুরুষ একাধিক নারীর সাথে যৌনতার ফ্যান্টাসিতে ভোগে, এমনকি সারা জীবনে তাদের পার্টনারের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে কল্পনা করে তারা আমোদিত হয়ে উঠে- আর মেয়েদের মধ্যে সে সংখ্যাটা মাত্র ৮ ভাগ। এলিস এবং সিমন্সের সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করা অর্ধেক সংখ্যক নারীরা অভিমত দিয়েছে, যৌনতা নিয়ে কল্পনার উন্মাতাল সময়গুলোতেও তারা কখনো সঙ্গী বদল করে না, অন্য দিকে পুরুষদের মধ্যে এই সংখ্যাটা মাত্র ১২ ভাগ। মেয়েদের যৌনতার ফ্যান্টাসিগুলো তার নিজের পরিচিত যৌনসঙ্গীকে কেন্দ্র করেই সবসময় আবর্তিত হয়, আর অন্যদিকে পুরুষদের যৌনতার ফ্যান্টাসিগুলো সময় সময় সম্পূর্ণ অপরিচিত মেয়েকে নিয়েও উথলে ওঠে । একারণেই গবেষক এলিস এবং সিমন্স তাদের গবেষণাপত্রে এই বলে উপসংহার টেনেছেন [6] –

> ‘পুরুষদের যৌনতার বাঁধন-হারা কল্পনাগুলো হয়ে থাকে সর্বব্যাপী, স্বতঃস্ফুর্ত, দৃষ্টিনির্ভর, বিশেষভাবে যৌনতাকেন্দ্রিক, নির্বিচারী, বহুগামী এবং সক্রিয়। অন্যদিকে মেয়েদের যৌন অভিলাস অনেক বেশী প্রাসঙ্গিক, আবেগময়, অন্তরংগ এবং অক্রিয়।’

ছেলে মেয়েদের যৌন-অভিলাসের পার্থক্যসূচক এই প্রবণতার প্রভাব পড়েছে আজকের দিনের বানিজ্যে এবং পন্য-দ্রব্যে। এমনি একটি দ্রব্য হচ্ছে ‘পর্নগ্রাফি’ অন্যটি হল ‘রোমান্স নভেল’। পর্নগ্রাফির মুল ক্রেতা নিঃসন্দেহে পুরুষ। পুরুষদের উদগ্র এবং নির্বিচারী সেক্স ক্রেজের চাহিদা পূর্ণ করতে বাজার আর ইন্টার্নেট সয়লাব হয়ে আছে সফট পর্ন, হার্ড পর্ন, থ্রি সাম, গ্রুপ সেক্স সহ হাজার ধরণের বারোয়ারি জিনিসপত্রে। এগুলো পুরুষেরাই কিনে, পুরুষেরাই দেখে। মেয়েরা সে তুলনায় কম। কারণ, মেশিনের মত হার্ডকোর পর্ন পুরুষদের তৃপ্তি দিলেও মেয়েদের মানসিক চাহিদাকে তেমন পূর্ণ করতে পারে না। সমীক্ষায় দেখা গেছে নারীর নগ্ন দেহ দেখে পুরুষেরা যেমন সহজেই আমোদিত হয়, মেয়েরা তেমনি হয় না। কারণ - মেয়েদের অবারিত সেক্স জাগ্রত করতে দরকার অবারিত ইমোশন!

আর মেয়েদের এই অবারিত আবেগ জাগ্রত করতে বাজারে আছে ‘রোমান্স নভেল’। এই সমস্ত প্রেমোপন্যাসের মূল ক্রেতাই নারী। দেদারসে প্রেম-পীরিতি-বিচ্ছেদের পসরা

---

[6] B.J. Ellis, D. Symons (1990), "Sex Differences in Sexual Fantasy: an Evolutionary Psychological Approach", *Journal of Sex Research*, Vol. 27 pp.527 - 555.

সাজিয়ে শ'য়ে শ'ইয়ে বই সাড়া দুনিয়া জুড়ে বের করা হয় – আর সেগুলো দেদারসে বিক্রি হতে থাকে সাড়া বছর জুড়ে, মূলতঃ মেয়েদের হাত দিয়ে। বাংলাদেশে যেমন আছে ইমদাদুল হক মিলন, তেমনি আমেরিকায় সুসান এলিজাবেদ ফিলিপ্স, ভারতে তেমনি সুবোধ ঘোষ কিংবা নীহারঞ্জন গুপ্ত । প্রেম কত প্রকার ও কি কি তা বুঝতে হলে এদের উপন্যাস ছাড়া গতি নেই। আমি শুনেছি, রোমান্স নভেলের জন্য প্রকাশকেরা ইদানিংকালে বিশেষতঃ উঠতি লেখকদের নাকি বলেই দেয় – কিভাবে তার উপন্যাস 'সাজাতে' হবে, আর কি কি থাকতে হবে। একটু প্রেম, অনুরাগ, কমিটমেন্ট, মান – অভিমান, বিচ্ছেদ, ক্লাইম্যাক্স তারপর মিলন। আবেগের পশরা বেশি থাকতে হবে, সে তুলনায় সেক্সের বাসনা কম। বইয়ের নায়িকার সেক্সের সাথে আবার আবেগ মিলিয়ে দিতে হবে, ইত্যাদি। এভাবে প্রতিদিনই তৈরি হচ্ছে রোমান্স নভেলের ম্যানুফ্যাকচারিং। মেয়েরা দেদারসে কিনছে, আবেগে ভাসছে, হাসছে, কখনো বা চোখের পানি ফেলছে। আর বই উঠে যাচ্ছে বেস্ট সেলার তালিকায়।

আরো কিছু আনুষঙ্গিক মজার বিষয় আলোচনায় আনা যাক। পশ্চিমা বিশ্বে এক সময় 'প্লে বয়'-এর পাশাপাশি একসময় প্লে গার্ল' চালানোর চেষ্টা করা হয়েছিলো। চলেনি। মেয়েরা এ ধরণের পত্রিকা কেনেনি, বরং কিনেছে সমকামী পুরুষেরা ঢের বেশি। ছেলেরা শুধু কেন বল খেলবে আর মেয়েরা পুতুল - এই শিকল ভাঙ্গার অভিপ্রায়ে ভিন্ন ধরণের খেলনা প্রবর্তনের চেষ্টা হয়েছিলো - চলেনি। কারণ কি? কারণ হচ্ছে, আমরা যত আড়াল করার চেষ্টাই করি না কেন, ছেলে মেয়েদের মানসিকতায় পার্থক্য আছে - আর সেটা দীর্ঘদিনের বিবর্তনীয় ছাপ থাকার কারণেই। এই ব্যাপারটিই প্রকাশিত হয়েছে ব্রিটিশ পত্রিকা ইন্ডিপেন্ডেন্টে এক মায়ের আর্তিতে। সেই মা পত্রিকায় (নভেম্বর ২, ১৯৯২) তার অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন –

> 'আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে আপনার পত্রিকার বিজ্ঞ পাঠকেরা কি বলতে পারবেন কেন একই রকমভাবে বড় করা সত্ত্বেও যতই সময় গড়াচ্ছে আমার দুই জমজ বাচ্চাদের মধ্যকার নারী-পুরুষজনিত পার্থক্যগুলো প্রকট হয়ে উঠছে? কার্পেটের উপর যখন তাদের খেলনাগুলো একসাথে মিলিয়ে মিশিয়ে ছড়িয়ে রাখা হয়, তখন দেখা যায় ছেলেটা ঠিকি ট্রাক বা বাস হাতে তুলে নিচ্ছে, আর মেয়েটা পুতুল বা টেডি বিয়ার'।

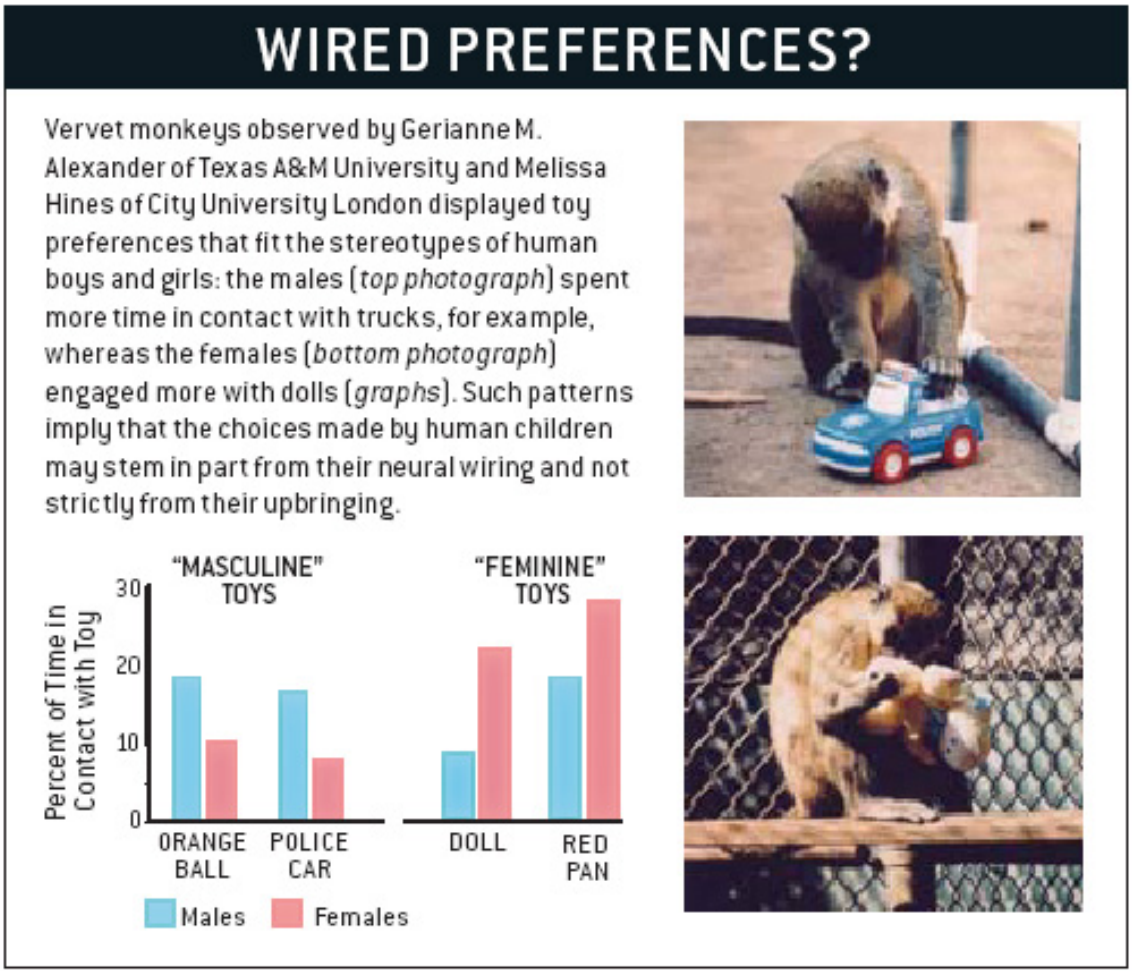

চিত্রঃ – বিজ্ঞানীরা ভার্ভেট বানর নিয়ে গবেষণা করে দেখেছেন ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে খেলনার প্রতি পছন্দের প্রকৃতি ভিন্ন হয়, যা আমাদের মানব সমাজের ছেলে- মেয়েদের খেলনা নিয়ে 'স্টেরিওটাইপিং'-এর সাথে মিলে যায় (*ছবি* – সায়েন্টিফিক আমেরিকানের সৌজন্যে)

শুধু মানব শিশু নয়, মানুষের কাছাকাছি প্রজাতি ভার্ভেট বানর (vervet monkeys) নিয়ে গবেষণা করেও বিজ্ঞানীরা দেখেছেন তাদের হাতে যদি খেলনা তুলে দেয়া হয়, ছেলে বানরেরা ট্রাক বাস গাড়ি ঘোড়া নিয়ে বেশি সময় কাটায় আর মেয়ে বানরেরা পুতুল কোলে নিয়ে। মানব সমাজে দেখা গেছে খুব অল্প বয়সেই ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে খেলনা নিয়ে এক ধরণের পছন্দ তৈরি হয়ে যায়, বাবা মারা সেটা চাপিয়ে দিক বা না দিক। দোকানে নিয়ে গেলে ছেলেরা খেলনা- গাড়ি কিংবা বলের দিকে হাত বাড়াতে শুরু করে, আর মেয়েরা পুতুলের প্রতি। এই মানসিকতার পার্থক্যজনিত প্রভাব পড়েছে খেলনার প্রযুক্তি, বাজার এবং বিপননে। যে কেউ আমেরিকার টয়েস আর আসের(toys r us) মত দোকানে গেলেই ছেলে- মেয়েদের জন্য খেলনার হরেক রকম সম্ভার দেখতে পাবেন।

কিন্তু খেলনা গুলো দেখলেই বোঝা যাবে – এগুলো যেন দুই ভুবনের দুই বাসিন্দাদের চাহিদাকে মূল্য দিতে গিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে বানানো।

গে মস্তিস্কের খোঁজে

বিজ্ঞানীরা ইঁদুর আর বানর নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছেন, মস্তিস্কের অভ্যন্তরে হাইপোথ্যালমাসের মধ্যে 'মেডিয়াল প্রিঅপ্টিক' বলে যে এলাকাটা (medial preoptic area) আছে, সেটা কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে যৌনতার পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে ছেলে ইঁদুরেরা মেয়ে ইঁদুরের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। বানর নিয়ে গবেষণা করেও বিজ্ঞানীরা একই ধরণের ফল পেয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত হাইপোথ্যালমাস- বিশিষ্ট বানরদের আচরণ হয়ে থাকে অনেকটা 'যৌন- প্রতিবন্ধী'র মত। মেয়ে বানরদের প্রতি তাদের কোন আকর্ষণই থাকে না। এ থেকে যৌনপ্রবৃত্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে হাইপোথ্যালমাসের গুরুত্ব বোঝা যাচ্ছে। মানুষের ক্ষেত্রেও হাইপোথ্যালমাস নামের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যঙ্গটির সাথে যৌনপ্রবৃত্তির সরাসরি সম্পর্ক আছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। তারা হাইপোথ্যালমাসের এলাকাকে অভিহিত করেন *ইন্টারস্টিয়াল নিউক্লি অব দ্য এন্টেরিয়র হাইপোথ্যালমাস* (INAH) নামের এক বিদঘুটে নাম দিয়ে। প্রতিটি নিউক্লিয়াসকে আবার তারা বিভিন্ন নম্বর দিয়ে – $INAH_1$, $INAH_2$, $INAH_3$, $INAH_4$,। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রজার গোর্কি এবং তার এক ছাত্রী লরা এলেন আশির দশকে মানুষের মস্তিস্ক বিশ্লেষণ করে দেখলেন ছেলেদের মস্তিস্কের তৃতীয় ইন্টারস্টিয়াল নিউক্লি অব দ্য এন্টেরিয়র হাইপোথ্যালমাস ($INAH_3$)এর আকার মেয়েদের থেকে অন্ততঃ তিনগুন বড় পাওয়া যাচ্ছে।

১৯৯০ সালে সিমন লেভি নামের এক আমেরিকান প্রখ্যাত স্নায়ুবিজ্ঞানী চিন্তা করলেন নারী পুরুষের হাইপোথ্যালমাস নিয়ে যখন এত কথা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে সমকামী ব্যক্তিদের হাইপোথ্যালমাসের কি অবস্থা সেটা একটু মেপে জোখে দেখা দরকার। তিনি ১৬ জন সমকামী পুরুষের এবং ছয় জন সমকামী মহিলার হাইপোথ্যালমাসের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা চালালেন। তিনি দেখলেন, গোর্কির মতই তিনিও ছেলেদের $INAH_3$- এর আকার মেয়েদের চেয়ে আকারে দু'গুন বড় পাচ্ছেন। কিন্তু সেই সাথে আরো একটা জিনিস পেলেন। সেটা হল - $INAH_3$- এর আকার বিষমকামীদের পুরুষদের চেয়ে সমকামী পুরুষদের ক্ষেত্রে দু থেকে তিনগুন ছোট। অর্থাৎ, সমকামী পুরুষদের নিউক্লি অব দ্য এন্টেরিয়র হাইপোথ্যালমাস এর আকার মেয়েদের $INAH_3$- এর সমান! লেভি পরবর্তীতে একটি হাসপাতালের ৪১ জন রোগীর উপর একই পরীক্ষা করেন। সেখানেও তিনি একই ফলাফল পেয়েছিলেন। লেভির এই পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি পরবর্তীতে উইলিয়াম

বাইন নামের আরেকজন বিজ্ঞানী করেছিলেন[7]। তিনিও একই ফলাফল পেয়েছেন, অর্থাৎ, সমকামী পুরুষদের নিউক্লি অব দ্য এন্টেরিয়র হাইপোথ্যালমাসটি আকারে বিষমকামী পুরুষদের চেয়ে ছোট, এবং অনেকটা মেয়েদের সমান।

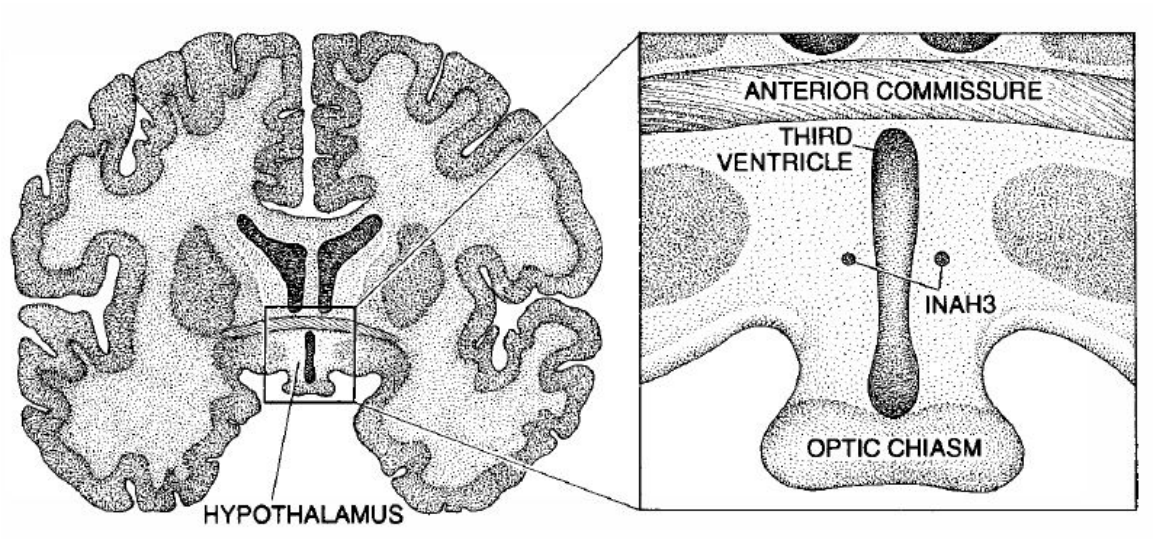

চিত্রঃ বিজ্ঞানীরা দেখেছেন মস্তিস্কের তৃতীয় ইন্টারস্টিয়াল নিউক্লি অব দ্য এন্টেরিয়র হাইপোথ্যালমাস ($INAH_3$) এর আকার বিষমকামীদের পুরুষদের চেয়ে সমকামী পুরুষদের ক্ষেত্রে দু থেকে তিনগুন ছোট হয়।

তার মানে কি? এর মানে কি এই যে সমকামী পুরুষদের মস্তিস্ক অনেকটা নারীসুলভ? বলা মুশকিল। বিজ্ঞানীরা এই অনুকল্পটিকে আরেকটু বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা করার চেষ্টা করলেন। তারা জানেন, শুধু $INAH_3$- এর আকারেই নয়, মস্তিস্কের আরো অন্যান্য প্রত্যঙ্গের আকারেও পার্থক্য পাওয়া গেছে। যেমন, মেয়েদের ভাষগত দক্ষতা যেহেতু ছেলেদের চেয়ে বেশি এবং একটু ভিন্নভাবে কাজ করে, তাদের কর্পাস কালোসাম (corpus callosum) এবং এন্টিরিয়র কমিসুর (anterior commissure) নামে দুইটি প্রত্যঙ্গের আকার পুরুষদের তুলনায় বড়। তাহলে সমকামীদের ক্ষেত্রে কি অবস্থা? হ্যা, আপনি যা সন্দেহ করেছেন তাই – সমকামী ব্যক্তিদের কর্পাস কালোসাম এবং এন্টিরিয়র কমিসুরের আকার বিষমকামী পুরুষদের চেয়ে আকারে বড় হয়, এবং মেয়েদের আকারের সাথে মিলে যায়। ১৯৯২ সালে লরা এলেন এবং রজার গোর্কি এন্টিরিয়র কমিসুর নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, সমকামীদের ক্ষেত্রে প্রত্যঙ্গটির আকার বিষমকামীদের চেয়ে

[7] Byne W, Tobet S, Mattiace LA, et al. (September 2001). "The interstitial nuclei of the human anterior hypothalamus: an investigation of variation with sex, sexual orientation, and HIV status". Horm Behav 40 (2): 86–92.

বড়[8]। আবার কর্পাস কালোসাম নিয়ে পরীক্ষা করে আরেকদল বিজ্ঞানী দেখেছেন, সমকামীদের ক্ষেত্রে এই প্রত্যঙ্গটির আকার বিষমকামীদের থেকে প্রায় শতকরা ১৩ ভাগ বেশী[9]।

তাহলে কি দাঁড়ালো? একসময় উলরিচস (পঞ্চম অধ্যায় দ্রঃ) যেমনটি ভেবেছিলেন – 'সমকামী পুরুষেরা আসলে পুরুষ দেহে বন্দি নারী আত্মার অতৃপ্ত প্রকাশ' – সেটাই কি তবে ঠিক?। অনেক বিজ্ঞানী পূর্বেকার সীমিত পরীক্ষা থেকে পাওয়া সিদ্ধান্তে তাই ভেবে নিয়েছিলেন। ঢালাও ভাবে ভেবে নেয়া হয়েছিল- সমকামিতার প্রকাশ মানে 'A female spirit in a male body'। সামাজিক ভাবেও আমরা দেখি সমকামী ছেলেদের 'মেয়েলী' বলে খোঁটা দেয়া হয়। তা হলে সত্যিই কি এই 'স্টেরিওটাইপিং' গুলোর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে? কিন্তু এখানে এসেই দাবার ছক আবারো উলটে গেলো। মানুষের মস্তিস্কের হাইপোথ্যালমাসে সুপ্রাকিয়াস্মিক নিউক্লিয়াস (VIP SCN nucleus) নামের যে এলাকাটি আছে, যেটার আকার ছেলেদের ক্ষেত্রে মেয়েদের চেয়ে বড় থাকে। তাহলে সমকামীদের ক্ষেত্রে এই প্রত্যঙ্গটির আকার কিরকম হবার কথা? নিশ্চয় ছোট এবং মেয়েদেরটার সমান তাই না? না, মোটেই তা নয় – সমকামীদের ক্ষেত্রে VIP SCN nucleus এর আকার পাওয়া গেল অনেক বড়, ছেলে মেয়ে দু দলের চেয়েই[10]। সে জন্যই জোয়ান রাফগার্ডেন তার 'ইভল্যুশন রেইনবো' বইয়ে শ্লেষের সাথে লিখেছেন –' So much for the belief that gay man have female brains!' তবে এ ব্যাপারে শেষ কথা বলার সময় এখনো আসেনি, হয়তো ভবিষ্যৎ গবেষণা এ ব্যাপারে আরো ভালভাবে পথ দেখাবে। আরো একটি ব্যাপারও এই সাথে লক্ষ্যনীয়। নারী সমকামীদের মস্তিস্কে এ ধরণের কোন প্যাটার্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি।

সমকামী পারিবারিক ধারার খোঁজে

আমার বাবা ক্রিকেট খেলতে পছন্দ করতেন। আমিও ছোটবেলায় তাই খেলতাম। এ ধরণের অনেক বৈশিষ্ট্যই আমরা ঐতিহ্য হিসেবে বয়ে নিয়ে যাই, পারিবারিক পরিবেশ থেকে শিখে নিয়ে। মা ভাল রান্না করলে মেয়েকেও সেই গুণ পেতে সাহায্য করেন। আবার কিছু জিনিস না চাইলেও আমাদের বহন করতে হয় জেনেটিক তথ্য হিসেবে বংশ

[8] Allen LS, Gorski RA (1992). "Sexual orientation and the size of the anterior commissure in the human brain". Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 89 (15): 7199–202. doi:10.1073/pnas.89.15.7199.
[9] Scamvougeras, A., Witelson, S.F., Bronskill, M., Stanchev, P., Black, S., Cheung, G., Steiner, M., Buck, B. Sexual orientation and anatomy of the corpus callosum. Society for Neuroscience Abstracts, 1994, p 1425.
[10] Swaab DF, Zhou JN, Ehlhart T, Hofman MA (1994). "Development of vasoactive intestinal polypeptide neurons in the human suprachiasmatic nucleus in relation to birth and sex". Brain Res. Dev. Brain Res. 79 (2): 249–59.

পরম্পরায়। চোখের এবং চুলের রঙ, নাকের গঠন, শরীর স্বাস্থ্য, হৃদরোগের ঝুঁকি সহ অনেক কিছুই। সমকামিতার ব্যাপারটিও আমরা পরিবারে বাহিত হতে দেখি। কিন্তু এটা কি জেনেটিক তথ্য হিসেবে পরিবারের ধারায় বয়ে চলে, নাকি পরিবেশ থেকে শেখা বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ?

বিজ্ঞানীরা এর উত্তর খুঁজতে প্রতিনিয়ত গবেষণা করে চলেছেন। তারা ইতোমধ্যেই দেখেছেন একটি জনসমষ্টিতে কোন ভাই বিষমকামী হলেও অন্ততঃ শতকরা ৪ ভাগ সম্ভাবনা থাকে তার পরবর্তী ভাইয়ের সমকামী হয়ে জন্মাবার। কিন্তু পরিবারের একভাই সমকামী হলে অন্ততঃ ২২ ভাগ সম্ভাবনা তৈরী হয় অপর ভাইও সমকামী হবার। অর্থাৎ পরিবারে সমকামী ভাই থাকলে পরিবারে সমকামী ধারা তৈরী হবার সম্ভাবনা অন্ততঃ চারগুন বেড়ে যায়। কিন্তু ভাই সমকামী হলে বোন লেসবিয়ান নাকি স্ট্রেট হবে কিনা – এ সংক্রান্ত কোন সম্ভাবনার ঝোঁক পাওয়া যায়নি[11]। কোন পরিবারে বোন সমকামী (লেসবিয়ান) হলে, অপর বোনেরও সমকামী হবার প্রবণতা দ্বিগুন বেড়ে যায়, কিন্তু ভাইয়ের উপর এর কোন সম্ভাব্যতার প্রভাব জানা যায়নি[12]।

যমজদের নিয়ে পরীক্ষা করেও কৌতুহলোদ্দীপক ফলাফল পাওয়া গেছে। ১৯৮৫ সালে রিচার্ড সি পিল্লার্ড এবং জেমস ডি ওয়েইনরিচ তাদের গবেষণায় দেখিয়েছেন সমকামিতার ধারাটি সম্ভবতঃ জেনেটিক তথ্য হিসেবে প্রবাহিত হয়। তারা দেখালেন যে, সদৃশ যমজদের (identical twins) ক্ষেত্রে এক ভাই সমকামী হলে অন্ততঃ পঞ্চাশ ভাগ সম্ভাবনা থাকে অপর ভাইও সমকামী হবার। আর অসদৃশ যমজদের (fraternal twins) ক্ষেত্রে এর সম্ভাবনা থাকে চব্বিশ ভাগের মত। এরপর থেকে অন্ততঃ পাঁচটি যমজদের নিয়ে যৌন-প্রবৃত্তি সংক্রান্ত গবেষণার খবর লিপিবদ্ধ হয়েছে[13]। ১৯৯১ সালে তাদের একটি গবেষণা থেকে জানা যায় সমকামী প্রবণতা সদৃশ যমজ দের মধ্যে ৫৭ ভাগ, অসদৃশ যমজ দের মধ্যে ২৪ ভাগ, এবং অযমজদের মধ্যে ১৩ ভাগ সমকামীভাবাপন্ন হয়ে থাকে[14]। একইভাবে মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে নারী সমকামিতার প্রবণতা সদৃশ যমজে থাকে শতকরা ৫০ ভাগ, অসদৃশ যমজে থাকে ১৬ ভাগ, এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে থাকে ১৩ ভাগ। ১৯৯৩ সালে এ ধরণের আরেকটি গবেষণা থেকে পাওয়া যায়, ছেলেদের সদৃশ যমজদের মধ্যে শতকরা ৬৫ ভাগ সমকামী প্রবৃত্তিসম্পন্ন হয়ে থাকে আর অসদৃশ

[11] Pillard RC, Weinrich JD., Evidence of familial nature of male homosexuality, Arch Gen Psychiatry. 1986 Aug;43(8):808-12.
[12] Bailey JM and Benishay DS, Familial aggregation of female sexual orientation, Am J Psychiatry 1993; 150:272-277
[13] Simon Levay and Dean H. Hamer, Evidence for a Biological Influence in Male Homosexuality, Scientific American, May 1994.
[14] Bailey JM, Pillard RC, A genetic study of male sexual orientation., Arch Gen Psychiatry. 1991 Dec; 48 (12) pp1089-96..

যমজদের ক্ষেত্রে সেটা ২৯ ভাগ[15]। একইভাবে নারীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সদৃশ যমজের ক্ষেত্রে শতকরা ৪৮ ভাগ সমকামী হয়, আর অসদৃশ যমজের ক্ষেত্রে সেটা মাত্র ৬ ভাগ[16]।

উপরের জরিপ গুলো সবই ছিল আমেরিকার। ১৯৯২ সালে ইংল্যান্ডে এই ধরণের একটি জরিপ চালানো হয়। সেখানকার জরিপেও প্রায় একই ধরণের ফলাফল বেরিয়ে আসে, যদিও সংখ্যাটা অনেক কম। সদৃশ যমজদের মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ এবং অসদৃশ যমজদের ক্ষেত্রে মাত্র ২.৫ ভাগ সমকামী পাওয়া গেছে[17]। অস্ট্রেলিয়ায় একটু ভিন্ন পদ্ধতিতে জরিপ চালানো হয়েছে। সেখানে অন্যান্য পদ্ধতির মত পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে যমজ সহোদর বাছাই করা হয়নি, বরং বাছাই করা হয়েছে নির্বাচনের ভিত্তিতে। তাদের জরিপ থেকে যে ফলাফল এসেছে তা হল – সেখানে সদৃশ যমজদের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ এবং অসদৃশ যমজদের ক্ষেত্রে মাত্র ০ ভাগ সমকামী পাওয়া গেছে; সদৃশ মেয়ে যমজদের শতকরা ২৪ ভাগ লেসবিয়ান হয় এবং অসদৃশ যমজদের ক্ষেত্রে সেটা প্রায় ১১ ভাগ[18]।

উপরের পরীক্ষাগুলোর শানে নজুল কি দাঁড়ালো তা হলে? পরীক্ষাগুলো থেকে একটি জিনিস স্পষ্ট ; সদৃশ যমজে দুই ভাইই সমকামী হবার সম্ভাবনা অসদৃশ যমজের দ্বিগুন পাওয়া যাচ্ছে। পরীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে সদৃশ যমজে দুই ভাইয়ের দুজনেই সমকামী হবার সম্ভাবনা শতকরা ২৫ থেকে ৫০, এই ফলাফল নির্ভর করে কিভাবে বা কোথায় পরীক্ষা করা হচ্ছে তার উপর। তার মানে জেনেটিক ফ্যাক্টর যদি আমরা ২৫ থেকে ৫০ বলে রায় দেই, তবে পরিবেশ এবং অন্যান্য ফ্যাক্টরের প্রভাব ৫০ থেকে ৭৫ ভাগ থেকেই যাচ্ছে।

এমনকি সদৃশ যমজদের দুই ভাইয়ের মধ্যেই সমকামিতা পাওয়ার যে ব্যাপারটিকে পুরোপুরি 'জেনেটিক' বলে ভাবা হচ্ছে, সেই দাবীও কতটুকু যুক্তিযুক্ত সেটাও খোলা মনে বিশ্লেষণের দাবী রাখে। দুই সদৃশ যমজ ভাই সাধারণতঃ একই পরিবেশে একই ভাবে বড় হয়, এবং একজনের পছন্দ, অপছন্দ অভিরুচি অনেক সময় অপরজনকেও দারুণভাবে প্রভাবিত করে। কাজেই, যে কেউ দাবী করতেই পারে যে, সদৃশ যমজে অসদৃশ যমজদের চেয়ে অধিক হারে সমকামী ভাতৃযুগল পাওয়া যাচ্ছে, এর কারণ 'অভিন্ন জিন' নয়, বরং তাদের বেড়ে উঠার 'অভিন্ন পরিবেশ'। থিওডোর লিজ নামে এক

---

[15] Frederick L. Whitam, Milton Diamond and James Martin, Homosexual orientation in twins: A report on 61 pairs and three triplet sets, Archives of Sexual Behavior, 22(3), 1993, pp 187-206.

[16] Bailey J M; Pillard R C; Neale M C; Agyei Y Heritable factors influence sexual orientation in women. Archives of general psychiatry 1993;50(3):217-23

[17] M King and E McDonald, Homosexuals who are twins. A study of 46 probands, The British Journal of Psychiatry 1993, 160: 407-409.

[18] Bailey, J. M., & Martin, N. G. A twin registry study of sexual orientation. Paper presented at the twenty-first annual meeting of the International Academy of Sex Research, Provincetown, MA, 1995.

মনোবিজ্ঞানী এই ব্যাপারটি উল্লেখ করে তার প্রতিক্রিয়াও জানিয়েছিলেন একটি জার্নালে[19]। এ উদাহরণটি আমাদের সামনে এ ধরণের পরীক্ষার জটিলতা স্পষ্ট করে তুলে। ফ্রয়েড যে কথাটা অনেক আগেই বলেছিলেন একটু অন্য ভাবে, সে কথাটাই হয়ত সত্য হয়ে ফিরে আসছে –

> 'সমকামিতার ক্ষেত্রে সমস্যাটা আরো গভীর। ... কারণ [সদৃশ] যমজেরা যেন আয়নার প্রতিবিম্ব হিসেবে বেড়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যকার স্বকাম (narcissism) আরো বিবর্ধিত করে তুলে' ।

তবে এই সমস্যার সমাধানের জন্য আরেক ধরণের পরীক্ষা করা যেতে পারে। যদি কোন সদৃশ যমজ জন্মের সময়েই আলাদা হয়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বড় হয়, এবং সেই উপাত্ত যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তবে হয়ত 'অভিন্ন' পরিবেশের ফ্যাক্টরটি বাদ দিয়ে শুধু জেনেটিক ফ্যাক্টর আলোচনায় আনতে পারব, এবং বলতে পারবো সমকামী প্রবৃত্তি সত্যই জেনেটিক কিনা।

১৯৮৬ সালে এ ধরণের একটি পরীক্ষার কথা জানা যায়[20]। ছয়টি সদৃশ যুগলের (চারটি ভগ্নি যুগল, এবং দুটি ভাতৃযুগল) সন্ধান পাওয়া যায় যারা আলাদা আলাদা পরিবেশে বড় হয়েছিলো, এবং যুগলদের মধ্যে একজন অন্ততঃ সমকামী। চারটি ভগ্নি যুগলের প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন সদস্য ছিলেন বিষমকামী, এবং অন্যজন সমকামী। একটি ভাতৃযুগলের ক্ষেত্রে দুই ভাইই ছিলেন সমকামী। একটি 'গে বার' এ পরিচয় হবার আগ পর্যন্ত এমনকি তারা একে অপরকে চিনতেনও না। আরেকটি ভাতৃযুগলের ক্ষেত্রে, দুই ভাই জন্মের পরেই বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা আলাদা পরিবেশে বড় হয়েছিলেন। এক ভাই ১৯ বছর পর্যন্ত উভকামী হিসেবে জীবন যাপন করেছিলেন, এবং তারপর পরিপূর্ণ সমকামী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। আর অন্য ভাই পনের থেকে আঠারো বয়স পর্যন্ত সমকামী ছিলেন, তারপর বিয়ে করে নিজেকে বিষমকামী হিসেবে সমাজে পরিচিত করেন। এই ক্ষেত্রে, অন্ততঃ সীমিত সময়ের জন্য হলেও উভয় সদস্যই সমকামিতার প্রবৃত্তি প্রদর্শন করেছিলো।

---

[19] Theodore Lidz, Md, Reply to 'A Genetic Study of Male Sexual Orientation', Arch Gen Psychiatry. 1993;50(3):240.

[20] ED Eckert, TJ Bouchard, J Bohlen and LL Heston , Homosexuality in monozygotic twins reared apart, The British Journal of Psychiatry, 1986, 148: 421-425

কাজেই উপরের পরীক্ষা থেকে একটি জিনিস বুঝা যাচ্ছে যে, জন্মের সময় বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং ভিন্ন পরিবেশে বড় হওয়া ভাতৃযুগলে সমকামিতার উন্মেষের পেছনে জেনেটিক উপাদান থাকতে পারে, কিন্তু এই জেনেটিক প্রভাব ভগ্নিযুগলে পাওয়া গেছে অনেক কম।

কিন্তু এই পরীক্ষাই শেষ কথা নয়। সমকামিতার উপর পরিবেশের প্রভাব আদৌ আছে কিনা, আর থাকলে কতটুকু – সেটা জানার জন্য আরেক ধরণের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বেইলি এবং পিল্লার্ডের ১৯৯১ সালের সেই পরীক্ষায় (আগে উল্লিখিত) দত্তক নেয়া সদৃশ যমজ সন্তানদের উপর জরিপ চালানো হয়। দেখা গেছে কোন সমকামী পরিবার বা ব্যক্তি দত্তক নিলে সেই ভাইয়ের সমকামী হিসেবে বেড়ে উঠার সম্ভাবনা (১১%) অনেক বেশি থাকে বিষমকামী পরিবার দত্তক নেয়ের চেয়ে (৫%)। কাজেই এ সমস্ত পরীক্ষা থেকে বোঝা যাচ্ছে, জেনেটিক ফ্যাকটরের পাশাপাশি পরিবেশের প্রভাবটিও থেকে যাচ্ছে পুরোমাত্রায়। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে মুখ্য কারণ হিসেবে প্রতিপন্ন করাটা এই মুহূর্তে আসলে সরলীকরণই হবে ।

গে জিনের খোঁজে

১৯৯৩ সালে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব হেলথের সমকামী বিজ্ঞানী ডিন হ্যামার এবং এঙ্গেলা প্যাতাউচির একটি যৌথ গবেষনাপত্র বিজ্ঞানের সম্ভ্রান্ত জার্নাল 'সায়েন্স'-এ প্রকাশিত হয়[21]। ডিন হ্যামারের সেই গবেষণাপত্রে শুধু সমকামী ধারাই নয়, সেই সাথে সমকামিতার উৎস হিসেবে ক্রোমোজমের মধ্যকার জেনেটিক একটি মার্কারের সন্ধান পাওয়া গেছে বলে প্রকাশিত হয়। এই ব্যাপারটিকে পরবর্তীতে কিছু পত্রপত্রিকা এবং মিডিয়া 'গে জিন' বলে প্রচার শুরু করে, এবং এর ফলশ্রুতিতে পক্ষে বিপক্ষে নানা ধরনের বিতর্ক শুরু হয়। এই গবেষণাপত্রটি তাই খুব সতর্কভাবে পর্যালোচনার দাবী রাখে।

ডিন হ্যামেরের আলোচিত গবেষণাতেও আগের অন্যান্য গবেষকদের মতই পরিবারের মধ্যে সমকামী ধারা খোঁজার একটি চেষ্টা করা হয়েছে; এবং এ গবেষণা থেকেও সেই একই উপসংহার বেরিয়ে আসে – পরিবারে সমকামী ভাই থাকলে সমকামী ধারা তৈরি হবার প্রবণতা বেড়ে যায় । হ্যামার তার গবেষণা থেকে যে ফলাফল পেলেন তা হল – যদি এক ভাই সমকামী হয়, তাহলে ১৪ ভাগ সম্ভাবনা থাকে অন্য ভাইয়েরও সমকামী

[21] Hamer DH, Hu S, Magnuson VL, Hu N, Pattatucci AM (July 1993). "A linkage between DNA markers on the X chromosome and male sexual orientation". Science, 261 (5119): 321–7

হবার, আর ভাই সমকামী না হলে সমকামী হবার সম্ভাবনা থাকে শতকরা মাত্র ২ ভাগ। কিন্তু হ্যামার এ পর্যন্ত গিয়েই থেমে গেলেন না। তিনি সমকামী পরিবারের দূরবর্তী আত্মীয় স্বজনদের পারিবারিক ধারাও বিশ্লেষণে আনলেন। আর এটা করতে গিয়েই বেরিয়ে এলো অজানা এক নতুন একটি দিক। তিনি দেখলেন, সমকামী ছেলের মামাদের মধ্যে শতকরা ৭ ভাগ এবং ফুতাতো ভাইদের মধ্যে শতকরা ৮ ভাগ সমকামী প্রবণতা সম্পন্ন পাওয়া ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বাবার দিকে অর্থাৎ চাচা কিংবা চাচাতো ভাইদের মধ্যে সেরকম কোন প্যাটার্ণ পাওয়া গেল না।

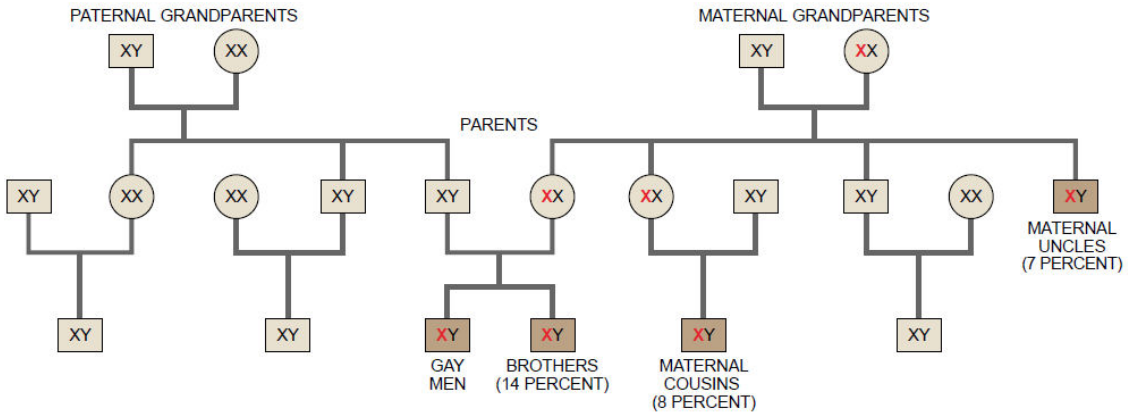

চিত্রঃ সমকামী পরিবারের দূরবর্তী আত্মীয় স্বজনদের পারিবারিক ধারা বিশ্লেষণ করে ডিন হ্যামার দেখলেন, সমকামী ছেলের মামাদের মধ্যে শতকরা ৭ ভাগ এবং ফুতাতো ভাইদের মধ্যে শতকরা ৮ ভাগ সমকামী প্রবণতা সম্পন্ন পাওয়া ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। তিনি ধারণা করলেন সমকামী প্রবণতা মায়ের দিক থেকেই জেনেটিক ভাবে প্রবাহিত হয়।

তাহলে এর ব্যাখ্যা কি? সমকামী প্রবণতা কি তাহলে মায়ের দিক থেকেই জেনেটিক ভাবে প্রবাহিত হয়? ডিন হ্যামারের গবেষণা সে দিকেই ইঙ্গিত করে। আমরা জানি একটি ছেলের দেহে দু ধরণের ক্রোমোজম থাকে। একটি হল Y যা সে বাবার কাছ থেকে সরাসরি পায়, আর অন্যটি X ক্রোমোজম - যা সে পায় মায়ের দিক থেকে। কাজেই জেনেটিক প্রবণতা মায়ের দিক থেকে পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত হবার অর্থ হচ্ছে X ক্রোমোজমে তার ছাপ থাকা। হ্যামার এবং তার গবেষক- দল জানালেন X ক্রোমোজমের একদম প্রান্তসীমার একটি এলাকা – যাকে Xq28 হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, এটাই সমকামী প্রবণতা তৈরির জন্য দায়ী। হ্যামার ৪০ জন সমকামী ভাতৃযুগলের উপর পরীক্ষা করে দেখলেন তাদের মধ্যে ৩৩ টি যুগলের মধ্যে এই Xq28 মার্কারের অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে। ৭ টিতে পাওয়া যায় নি (বিষমকামীদের ক্ষেত্রে এই মার্কারটি ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত থাকে)। বলা হল যদিও নমুনাক্ষেত্র খুব একটা বড় ছিলো না, তদুপরি ৪০ জনের মধ্যে

৩৩ জনে মার্কার খুঁজে পাওয়াটা আসলেই 'স্ট্যাটিস্টিকালি সিগনিফিকেন্ট'[22]। এইটাই হল ডিনহ্যামারের সমকামিতা নিয়ে মাইলফলক গবেষনার সারসংক্ষেপ। তার পরীক্ষায় পাওয়া এই Xq28 মার্কারটি 'গে জিন' হিসেবে 'প্রচারের আলোয় উঠে আসে। আর অনেকেই ডিন হ্যামারের কাজকে এভাবে ব্যাখ্যা করে দিলেন যে, 'ক্রোমোজমের Xq28 এলাকায় একটি জিন পাওয়া গেছে যা সমকামিতাকে ত্বরান্বিত করে'।

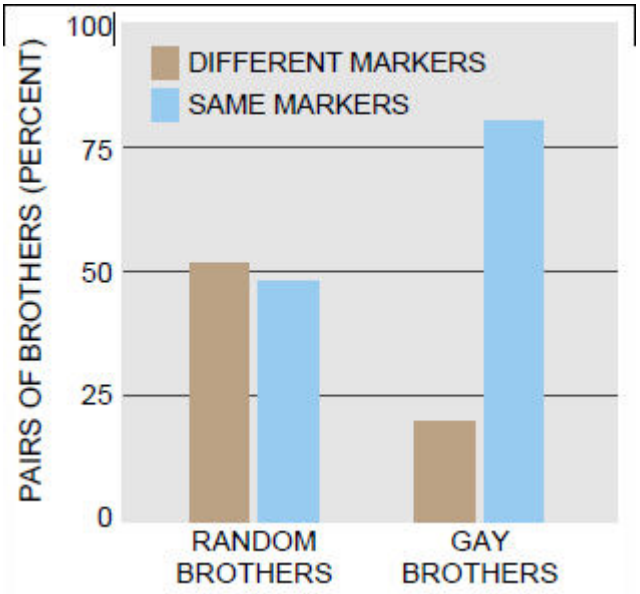

চিত্রঃ ডিন হ্যামারের হ্যামার ৪০ জন সমকামী ভাতৃযুগলের উপর পরীক্ষা করে X ক্রোমোজমের একদম প্রান্তসীমার একটি এলাকা – যাকে Xq28 হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, সমকামী প্রবণতার উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

কিন্তু ব্যাপারটি মোটেই এত সহজ সরল নয়। এই ফলাফল খুব নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণের দাবী রাখে। প্রথম কথা হল ৪০ টি যুগলের মধ্যে ৭ টি যুগলে এই Xq28 মার্কারটি

[22] Simon Levay and Dean H. Hamer, Evidence for a Biological Influence in Male Homosexuality, Scientific American, May 1994.

পাওয়া যায়নি। সমকামিতার প্রবৃত্তি তৈরিতে যদি Xq28 মার্কার থাকা 'অত্যাবশকীয় নিয়ামক' হতো, তাহলে ৪০ টি যুগলের স্যাম্পলের সবগুলোতেই এটি পাওয়া যাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু সেটা হয়নি। যদি ৪০টি স্যাম্পলের মধ্যে মোটামুটি ২০টিতে পাওয়া যেত, আর বাকি ২০ টিতে না পাওয়া যেত, তবে আমরা বলতে পারতাম সমকামিতার প্রবৃত্তির সাথে এই মার্কারের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু সেটাও হয়নি। মার্কার পাওয়া গেছে চার-পঞ্চমাংশ ক্ষেত্রে। ৪০টি স্যাম্পলের মধ্যে ৩৩টিতে মার্কার পাওয়ার ক্ষেত্রটি নিঃসন্দেহে ফলাফলের পারিসাংখ্যিক গুরুত্বকে তুলে ধরে। ডিন হ্যামার হিসাব করে দেখিয়েছেন শুধুমাত্র সম্ভাবনার নিরিখে হিসেব করলে এমনি এমনি (নির্বিচারে) এটা ঘটার সম্ভাবনা ২০০ ভাগের মধ্যে ১ ভাগেরও কম। সে হিসেবে জেনেটিক প্রভাব থাকার প্রবণতাটাকে অস্বীকার করা হয়তো যাচ্ছে না, কিন্তু এটা কখনোই শেষ কথা বলার নিশ্চয়তাও দিয়ে দিচ্ছে না। মোটা দাগে বললে, যেহেতু যমজ ভাতৃযুগলের দুজনই সব সময় সমকামী ভাবাপন্ন হয় না, সেহেতু মার্কার থাকলেই সমকামী হবে – এটা হলফ করে বলা যাচ্ছে না। আবার উল্টো দিক থেকে দেখলে, কোন মার্কার না থাকা সত্ত্বেও ৭ টি ভাতৃযুগলে সমকামী প্রভাব পাওয়া গেছে। তার মানে, মার্কারের সাথে কিংবা জিনের সাথে সমকামী প্রবৃত্তির সরাসরি সম্পর্ক শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যাচ্ছে না।

আর তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেই মার্কারের সাথে জেনেটিক একটা প্রভাব আছেই, তবুও সেটি একটিমাত্র জিনের সাথে কখনোই নয়। ডিন হ্যামার নিজেই সে কথা বলেছেন এভাবে[23] –

> 'কোন একটি জিনকে (এ পরীক্ষায়) পৃথক করা যায়নি। পরীক্ষার মাধ্যমে যা করা হয়েছে তা হল - ক্রোমোজমের একটি অংশ সনাক্ত করা, যে অংশটি দৈর্ঘ্যে চার মিলিয়ন বেস যুগলের সমান। এই অংশটি সমগ্র মানব জিনোমের শতকরা ০.২ ভাগেরও ছোট, কিন্তু তারপরেও এই অংশটিতে অবলীলায় কয়েকশত জিন এঁটে যেতে পারে। এই এলাকায় নিয়ামক জিনটি খুঁজে বের করা অনেকটা খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজার মতই। সূঁচ পেতে হলে হয় আমাদের হয় আরো অনেক বেশী পরিবার দরকার হবে, অথবা সম্ভ্যাব্য সকল এলাকার ডি.এন.এ-র অনুক্রমের সম্পূর্ণ তথ্য জানা চাই'।

[23] Simon Levay and Dean H. Hamer, Evidence for a Biological Influence in Male Homosexuality, Scientific American, May 1994.

হ্যামার নিজে ১৯৯৫ সালে পরীক্ষাটি পুনর্বার পরিচালনা করেন হু, পাত্তাউচি এবং অন্যান্যদের সাথে মিলে। এই পরীক্ষাটি সম্পন্ন হয় ৩২ টি স্যাম্পল নিয়ে, এবং এর মধ্যে ২২ টি ক্ষেত্রে তিনি আগের পরীক্ষার মতই Xq28 মার্কার খুঁজে পেলেন[24]। অর্থাৎ, শতকরা প্রায় ৬৮ ভাগ ক্ষেত্রে তিনি নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারলেন যে, মার্কারের সাথে সমকামিতার একটা প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক আছে। এ ছাড়া স্যান্ডার এবং প্রমুখের ১৯৯৮ সালের গবেষনায়ও ৫৪টি স্যাম্পল নিয়ে পরীক্ষা করা হয়, এবং এর মধ্যে শতকরা ৬৬ ভাগ ক্ষেত্রে সমকামিতার সাথে Xq28 মার্কারের সম্পর্ক পাওয়া যায়[25]।

১৯৯৯ সালে ক্যানাডায় জর্জ রাইসের নেতৃত্বে গবেষকের একটি দল ডিন হ্যামারের পরীক্ষাটিই করার চেষ্টা করলেন নমুনা ক্ষেত্র আরো বাড়িয়ে দিয়ে। এই পরীক্ষায় সমকামী ভাতৃযুগল সংগ্রহ করার জন্য কানাডার গে ম্যাগাজিন *Xtra*তে বিশাল বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, শেষ পর্যন্ত ৪৬ টি যুগল নিয়ে কাজ শুরু করা হয়। এই যুগলগুলো নির্বাচিত হয় 'সমকামী সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী' (gay interviewer) দের মাধ্যমে।

এই পরীক্ষায় ৪৬ টি যুগলের মধ্যে মাত্র ২০টি যুগলে মার্কার পাওয়া গেল[26], পারিসাংখ্যিক হিসেবে যা অর্ধেকেরও কম। যদি সমকামিতার সাথে মার্কারের নিশ্চিত সম্পর্ক থাকতো তবে ৪৬টির মধ্যে ৪৬টিতেই মার্কার পাওয়া যেত। তা তো হয়ইনি, বরং যদি হ্যামারের মত 'স্ট্যাটিস্টিকালি সিগনিফিকেন্ট' ৬৮% ফলাফলেরও পুনরাবৃত্তির কথা বিবেচনা করি, তবে মার্কার পাওয়া যাওয়ার কথা ছিলো অন্তত ৩২ টি। যদি এলোপাথাড়ি ভাবে ঘটা সম্ভাবনার হার শতকরা পঞ্চাশভাগের কথাও চিন্তা করি, তাহলেও মার্কারের সংখ্যা আসা উচিৎ ছিলো ২৩টি। কিন্তু ২০টি মাত্র মার্কার পাওয়াকে কোনভাবেই কোন ধরণের সম্পর্কে ফেলা যায় না। কাজেই অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন এই পরীক্ষাটি Xq28 মার্কারের সাথে 'গে জিন' পাওয়ার আগের দাবীগুলোকে ভুল প্রমাণ করে দেয়[27]। ক্যানাডিয়ান গবেষকেরা তার ফলাফল সম্বন্ধে উপসংহার টেনে বলেন,

> আমাদের ফলাফল হ্যামারের মূল পরীক্ষার ফলের সাথে এত পাথর্ক্য কেন তৈরি করলো তা পরিস্কার নয়। ... সে যাই হোক, আমাদের এই পরীক্ষার উপাত্ত যৌনপ্রবৃত্তির উপর Xq28 এলাকায় অবস্থিত একটি জিনের প্রভাব

[24] Hu S, Pattatucci AM, Patterson C, et al. (November 1995). "Linkage between sexual orientation and chromosome Xq28 in males but not in females". Nat. Genet. 11 (3): 248–56.
[25] Wilson, G.D., & Rahman, Q. (2005). Born Gay: The Biology of Sex Orientation. London: Peter Owen Publishers.
[26] Rice, Anderson, Risch and Ebers (1999) Male Homosexuality: Absence of Linkage to Microsatellite Markers at Xq28. Science 23(5414): pp. 665-667.
[27] 'The result demonstrates that there is no gay gene in Xq28' (ref. Joan Roughgarden, Evolution's Rainbow: Diversity, Gender, and Sexuality in Nature and People, University of California Press, May 17, 2004)।

> থাকার দাবীকে সমর্থন করে না। ... (যদিও) এই ফলাফল জিনোমের অন্য কোন জায়গায় সমকামিতার উপর জিনের প্রভাবকে বাতিল করে দেয় না।

এই 'গে জিন' পাওয়ার সাম্প্রতিক এই পরীক্ষাগত ব্যর্থতা অবশ্যই একটি ময়নাতদন্ত দাবী করে। সারা মিডিয়া জুড়ে 'গে জিন' নিয়ে এত হৈ চৈ হল, অথচ দুইটি বড় পরীক্ষায় দুই রকম ফলাফল বেরিয়ে এলো কেন? তবে কি হ্যামার পরীক্ষায় কোন বড় ভুল করেছিলেন, কিংবা ভাল ফলাফল পেতে ডেটা পরিবর্তন করেছিলেন? নাকি ক্যানাডিয়ান গবেষকেরা সমকামী যুগল নির্বাচনের সময় সনাক্তকরণে ভুল করেছিলেন? এই শেষ বিচারের ফয়সলা এখনো হয়নি। হ্যামার অবশ্য ক্যানাডিয়ীয় গবেষকদের ফলাফল প্রত্যাখান করেছেন এই বলে[28] –

> 'তারা (ক্যানাডীয় গবেষকেরা) প্রথমেই ধরে নিয়েছিলেন গে জিন বলে কিছু নেই, এবং তাদের পরীক্ষা ছিলো পক্ষপাত দুষ্ট, কারণ পরীক্ষকের একজন প্রথম থেকেই 'গে জিন বলে কিছু নেই' - সেটা প্রমাণেই তৎপর ছিলেন। তাদের সেই (সমকামবিদ্বেষী) মনোভাবেরই প্রতিফলন ঘটেছে তাদের পরীক্ষায়'।

তবে হ্যামার যাই বলুক না কেন গে- জিন নিয়ে পরীক্ষার ফলাফল একটা বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে আছে সাধারণ মানুষ এবং নিরপেক্ষ গবেষকদের কাছে। তাদের কাছে বিষয়টি এখনো 'অমীমাংসিত মামলা'ই।

তবে 'অমীমাংসিত' বলে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। এ সংক্রান্ত গবেষণা কিন্তু থেমে নেই। জিনের পথ ধরে সমাধানের পথ খুঁজতে এবারে এগিয়ে এসেছে এপিজেনেটিক্স[29]। এই এপিজেনেটিক্স উপরের সমস্যার একটা আকর্ষণীয় সমাধান হাজির করছে, যা ক্রমশঃ বিজ্ঞানীদের কাছে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। তারা দেখেছেন, জিন কেবল একা একা কাজ করতে পারে না, কাজ করে পরিবেশ থেকে পাওয়া সংকেতের মিথস্ক্রিয়ায়। বৈদ্যুতিক বাতির সুইচের যেমন টার্ণ অন বা অফ করা যায়, ঠিক তেমনি পরিবেশ থেকে পাওয়া সংকেতের প্রভাবে জিনের সক্রিয়করণ (activation) বা নিষ্ক্রিয়করণ (deactivation) ঘটে । বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন মিথাইলেশন। দেখা গেছে আমাদের চারপাশের বহু কিছুই - পরিবেশ, খাদ্যাভাস, পানীয় বা ধূমপানে আসক্তি, মানসিক পীড়নসহ বহুকিছুতেই এই প্রক্রিয়াটি প্রভাবিত হয়। এই মিথাইলেশন হয় বলেই সদৃশ যমজ ভাতৃযুগলে

[28] Michael Abrams, The Real Story on Gay Genes, Discover Magazine, June, 2007

[29] এপিজেনেটিক্স নিয়ে বিস্তারিত জানতে এই বইয়ের পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত 'মানব প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তিগুলো কি জন্মগত নাকি আচরণগত?' অংশটি দ্রষ্টব্য।

জেনেটিক কোডে শতভাগ মিল থাকলেও তাদের আচরণে, মন মানসিকতায় কিংবা কাজকর্মে বিস্তর পার্থক্য থাকে অনেক সময়ই। মিথাইলেশনের প্রভাবে জেনেটিক কোডের একাংশ বা একাধিক অংশ টার্ণ অফ হয়ে যেতে পারে। কাজেই একই জেনেটিক কোড থাকা সত্ত্বেও জেনেটিক সুইচের টার্ণ অন বা অফের কারণে একভাই বিষমকামী, আরেকভাই হয়ত সমকামী ভাবাপন্ন হয়ে উঠতে পারে। এ শুধু তত্ত্ব কথা নয়, এই ধারণার স্বপক্ষে কিছুটা প্রমাণ পাওয়া গেছে সভেন বকল্যান্ডের গবেষণায়। তিনি যমজ ভাইয়ের ঠিক কোন জায়গায় জিন টার্ণ অন বা অফের কারণে প্রবৃত্তির পরিবর্তন ঘটে তার হদিস এখনো না পেলেও সাম্প্রতিক একটি গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন, সমকামী ছেলের জন্ম দেয়া মায়ের এক্স ক্রোমোজমের সক্রিয়তা অন্য মায়েদের চেয়ে ভিন্ন হয়। [30]

কিন্তু কিভাবে একটি জিন পরিবেশের প্রভাবে সক্রিয় বা অক্রিয় হয়ে যায়? একটি ভাল উদাহরণ হতে পারে স্ট্রেস হরমোন করটিসোল। ইঁদুর নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, কর্টিসোল স্থায়ীভাবে জিনের একাংশকে নিষ্ক্রিয় (turn off) করে দিতে পারে, এবং এর ফলে ইঁদুরের স্বভাবে পরিবর্তন ঘটে। মানুষের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানীরা একই রকম ফলাফল লক্ষ্য করেছেন। তারা দেখেছেন, মানসিক চাপের মধ্যে থাকলে মানবদেহে এই হরমোনের আধিক্য বৃদ্ধি পায়। চাপময় পরিবেশে বেশি দিন কাটালে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যায় – ফলে দেহ সহজেই সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হয় সে সময়। কিন্তু 'ধান ভানতে শীবের গীতের মত' এই কর্টিসোল নিয়ে পড়ে যাওয়া হল কেন? এই স্ট্রেস হরমোনের সাথে সমকামিতার কি কোন সরাসরি সম্পর্ক আছে? বিজ্ঞানীরা বলেন, থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। জার্মান ডাক্তার গান্টার ডর্নারের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চাপময় পরিবেশে যে সমস্ত মা গর্ভবতী হয়েছিলেন, তাদের সন্তানদের একটা বড় অংশ নাকি সমকামী হিসেবে গড়ে উঠেছিলো ইতিহাসের অন্য সময়ের চেয়ে অনেক বেশি[31]। এমনকি ইঁদুর নিয়ে গবেষণা করতে গিয়েও বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, যে সমস্ত ইঁদুরেরা গর্ভের সময় চাপময় পরিবেশে দিন কাটায়, তাদের সন্তানের মধ্যে পরবর্তীতে সমকামিতার আধিক্য তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। অনেক সময় আবার বিভিন্ন এলার্জিক প্রতিক্রিয়ায় দেহে টেস্টোসটেরোন হরমোনের (পুরুষ হরমোন) প্রতি সংবেদনশীলতা কমে যায়। যে সমস্ত মায়েরা সারা জীবনে অধিক সংখ্যক সন্তানের জন্ম দেয়, তাদের ক্ষেত্রে শেষের দিককার সন্তানদের জন্মের সময় এ ধরণের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে বলে জানা গেছে। রে ব্ল্যানচার্ডের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, কোন পরিবারে বড় ভাই থাকলে তার পরের ভাইদের সমকামী যৌনপ্রবৃত্তি তৈরী করার সম্ভাবনাকে শতকরা ২৮ থেকে ৪৮ ভাগ

[30] Bocklandt S, Horvath S, Vilain E, Hamer DH (February 2006). "Extreme skewing of X chromosome inactivation in mothers of homosexual men". Hum. Genet. 118 (6): 691–4.
[31] Matt Ridley, The Red Queen: Sex and the Evolution of Human Nature, Harper Perennial, 2003.

বাড়িয়ে দেয়[32]। অর্থাৎ, একটি পরিবারে বড় ভাইদের সংখ্যা যত বেশী হবে, তত বেশি হবে পরবর্তী সন্তানের সমকামী হবার সম্ভাবনা (একে জনপ্রিয়ভাবে 'ওল্ডার ব্রাদার ইফেক্ট' হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়)। কারণ দেখা গেছে, যত বেশি সন্তানের জন্ম হয়, তত বেশি মায়ের টেস্টোসটেরোন হরমোনের প্রতি এলার্জিক প্রতিক্রিয়াও বাড়তে থাকে। হরমোন নিয়ে এই সাম্প্রতিক পরীক্ষাগুলো গুরুত্বপূর্ণ হলেও কোন কিছুই আসলে নিশ্চিত নয়। বহু মহিলাই আসলে বিভিন্ন সময়ে চাপযুক্ত পরিবেশে সন্তান জন্ম দিয়ে থাকেন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তাদের সবার সন্তান বড় হয়ে সমকামী হয়। আমার নিজের জন্মও হয়েছিলো একাত্তরের দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে, আমার বাবা যখন দেশের সীমান্তে ছিলেন যুদ্ধরত। এমন পরিস্থিতিতে জন্ম নিয়েও কিন্তু আমি সমকামী হিসেবে বেড়ে উঠিনি। কিংবা আমার জন্মের কারণে কোন 'ওল্ডার ব্রাদার ইফেক্ট' আমার ছোট ভাইয়ের উপরও পড়েনি । এমন উদাহরণ চারপাশে অজস্রই আছে। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় সমকামী সন্তানের জন্মদেয়া মায়েদের নিয়ে একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছে। তাদের প্রশ্ন করা হয়েছে যে, বিষমকামী সন্তানের জন্ম দেয়ার তুলনায় সমকামী সন্তানের জন্ম দেয়ার সময়টিতে কি তারা অধিক চাপযুক্ত পরিস্থিতিতে ছিলেন কিনা। তাদের মতামত থেকে এমন কোন আলামত পাওয়া যায়নি যে, সমকামী সন্তানের জন্মের সময় কোন চাপময় পরিস্থিতি তারা অতিবাহিত করেছিলেন[33]। কাজেই মায়ের মানসিক চাপের সাথে সন্তানের সমকামিতার কোন প্রত্যক্ষ যোগসূত্র আসলে প্রতিষ্ঠিতই হয়নি। এ ছাড়া, গান্টার ডর্নারের মূল পরীক্ষার ' উদ্দেশ্য' ও প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে বিভিন্ন মহলে। গান্টার তার গবেষণাপত্রে সমকামিতাকে ' মানসিক প্রতিবন্ধিত্ব' (psychic disability) হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন এবং বলেছিলেন, ' অদূরভবিষ্যতে সমকামিতার বিস্তার রোধ করা সম্ভব হবে' । তার এই মনোভাব নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলেই তুমুল প্রতিবাদ হয়েছে, তার সমকামিতার প্রতি বিদ্বেষমূলক মনমানসিকতাকে ইতিহাসের কলঙ্কজনক ইউজিনিক্সের (eugenics) সাথেও তুলনা করা হয়েছে।

গে জিন নিয়ে মিডিয়ায় এত ঔতসুক্যই বা কেন?

বৈজ্ঞানিক গবেষণার বাইরেও রাজনৈতিক একটা মতাদর্শগত লড়াই যে চলছে তার প্রভাব কিছুটা হলেও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রগুলোতেও পড়ছে। রক্ষণশীল সমাজের চাপে সাড়া দুনিয়া জুড়েই সমকামীদের অধিকার আদায়ের জন্য লড়তে হচ্ছে। এই সমকামী অধিকার

[32] Blanchard, R. (1997). Birth order and sibling sex ratio in homosexual versus heterosexual males and females. Annual Review of Sex Research, 8, 27-67.
[33] Francis Mark Mondimore, A Natural History of Homosexuality, The Johns Hopkins University Press, 1996

কর্মীদের অনেকেই ভাবেন, যদি কখনো প্রমাণ পাওয়া যায় যে সমকামী প্রবণতা জৈবিকভাবে অঙ্কুরিত হয় –সেটা সমকামীদের দাবী আদায়ের জন্য অনেক উপকারে আসবে। কারণ, তারা তখন আরো বলিষ্ঠভাবে মানুষজনকে বোঝাতে পারবেন যে, 'সমকামীরা জন্মগতভাবেই সমকামীপ্রবণতা নিয়ে জন্মায়', এতে তাদের কোন 'দোষ' নেই। 'এডভোকেট' নামে একটি মার্কিন গে এবং লেসবিয়নদের পত্রিকায় এ নিয়ে ১৯৯৬ সালে একটি জরিপ চালান হয়, সেখানকার শতকরা ৬১ ভাগ পাঠক মত দিয়েছিলো যে, 'যদি সমকামিতার পেছনে কোন জেনেটিক কারণ আছে বলে জানা যায়, সেটা তাদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করবে'[34]।

তবে এই দলের মধ্যে বিপরীত মতও আছে। যদি সমকামী প্রবণতা 'জেনেটিক' বলে প্রমাণিত হয়, তবে একে 'জেনেটিক রোগ' হিসেবে চিহ্নিত করে দেবার প্রবণতাও হয়তো বৃদ্ধি পাবে। এ ধরণের ভয় থেকে অনেকে আবার জিনের সাথে সম্পর্ক না পাওয়া গেলেই বরং ভাল বলে মনে করেন। তারা আশঙ্কা করেন আগে ডাক্তারেরা যেভাবে সমকামিতাকে 'মানসিক ব্যাধি' হিসেবে চিহ্নিত করে নানা উপায়ে রোগমুক্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছেন, সেরমকম প্রবণতা হয়তো জেনেটিস্টদের মধ্যেও ভবিষ্যতে দেখা যাবে; তারা হয়ত হান্টিংটন ডিজিজ, আলসাইমার্স, মাইগ্রেন, সিকেল সেল এনিমিয়ার মত সমকামিতাকেও জেনেটিক রোগ হিসেবে দেখিয়ে তার চিকিৎসার দাওয়াই তখন বাৎলে দিতে চাইবেন। Xq28 এলাকার ঠিক পাশেই ক্রোমোজমের ভিন্নতার কারণে *অকুলার এলবেনিজম* এবং *মেনকিস ডিজিস* নামে দুটি দুর্লভ জেনেটিক রোগ তৈরি হয় বলে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন। সমকামিতাও কি সে ধরণের কোন জেনেটিক রোগ? এর জবাব আমরা খুঁজতে চেষ্টা করবো পরবর্তী অধ্যায়ে।

[34] "it would mostly help gay and lesbian rights if homosexuality were found to be biologically determined"; The Advocate (1996, February 6). Advocate Poll Results. p. 8.